দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার
৪ ডিসেম্বর ২০১৬, বারডম হাসপাতাল, ঢাকা
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: ওয়ালিদ হাসান রাজীব

প্রশ্ন: স্কুল জীবনে পড়াশোনা করতে কেমন লাগত আপনার?

আবদুস সালাম: পড়াশোনা তো অবশ্যই ভালো লাগত। নিয়মিত পড়াশোনা করতাম। তবে ক্লাশের পড়ার চেয়ে বাইরের বইপত্রই বেশি পড়তাম। ওটাতে বেশি ইন্টারেস্ট ফিল করতাম। পড়ার অভ্যাসটা হয়েছিল খুব অল্প বয়সে।

প্রশ্ন: একাডেমিক পড়াশোনাও ভালো লাগত?

আবদুস সালাম: নিয়মিত পড়ালেখা করা বেশ দরকার। অন্তত এদের (শাসকশ্রেণির) এজুকেশন সিস্টেমের (শিক্ষা ব্যবস্থার) স্বরূপটা বোঝার জন্য হলেও একাডেমিক লেখাপড়া করা দরকার। সেজন্য আমি নিয়মিত ক্লাসের বইপত্রও পড়তাম। খুঁটিনাটি সবকিছু পড়তাম। নিয়মিত পরীক্ষায় অংশ নিতাম, আর ফলাফলও ভালো হত। পড়াশোনায় কখনো ফাঁকি দিইনি। রেগুলার (নিয়মিত) ক্লাসও করতাম। তবে ক্লাশে ইন্টারেস্ট ফিল করলে থাকতাম, না হলে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে আসতাম।

প্রশ্ন: স্কুলের শিক্ষকেরা কী রকম ছিলেন?

আবদুস সালাম: স্কুলের শিক্ষকেরা মোটামুটি কেয়ারিং (যত্নবান) ছিলেন। হয়ত আমার পরিবারের পরিচিতির কারণে প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা আমার দিকে একটু বেশি নজর দিতেন।

প্রশ্ন: ছাত্রজীবনে সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক চর্চা করতেন?

আবদুস সালাম: স্কুলে যেসব সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হতো, তাতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতাম। একবার নবম শ্রেণিতে পড়াকালে প্রবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম। পাকিস্তান আমলের ঘটনাতো। লেখার বিষয় ছিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের জীবনী। সে

সময় লিয়াকত আলী খান সম্পর্কে লিখেছিলাম যে, তিনি এমন এক দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন, যেখানে যারা ইন্ডিয়া থেকে পাকিস্তানে আসল, তারা প্রকৃত মর্যাদা পেল না। ফলে লিয়াকত আলী খান সকল নাগরিকের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে পারেননি। প্রবন্ধে এসব লেখার পরও আমার জন্য প্রথম পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। তবে প্রাইজ গিভিং সিরিমনিতে (পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে) একজন পাঞ্জাবি এসডিও ছিলেন। তিনি আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "পাঞ্জাবেও এ রকম অবহেলিত মানুষ আছে, তোমাদের মতন, তুমি যা লিখেছ তা সত্য বটে, কিন্তু একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এভাবে লেখা উচিৎ নয়" ইত্যাদি।

তাছাড়া বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতাতেও অংশগ্রহণ করতাম। ফুটবল খেলতাম। লেফট উইয়ে খেলতাম। তখন ইন্টার স্কুল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলাম কয়েকবার। আমি একটা জিনিস সব সময় মাথায় রাখতাম – যেটা করব সিরিয়াসলি করব।

আমি মনে করি, লেখাপড়া-খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আরো প্রসারিত হয়েছে। পুঁথিগত বিদ্যার মানে ক্লাশের পড়ালেখা বাইরে আমাকে অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন আমাকে সহায়তা করেছে। বিশেষ করে পৌরবিজ্ঞান পড়তে গিয়ে নাগরিক অধিকার, কর্তব্য, রাষ্ট্রের আইন-কানুন, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছি। এ বিষয়গুলো যখন পড়তাম তখন ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। এই ভালোভাবে বুঝতে গিয়েই আমার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হয়েছিল।

প্রশ্ন: রাজনীতির পাশাপাশি ওকালতি, সেটা কবে থেকে শুরু করেছিলেন? কী মনে করে?

আবদুস সালাম: আমি তো উকিল হওয়ার জন্য আইন পড়িনি। আইনে ভর্তি হয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে এজন্য। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের গ্রুপ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ায় আমাদের আর কোনো রাজনৈতিক ইউনিট ছিল না। [প্রকাশ্য সংগঠন পূর্ব বাংলা মার্কসবাদী লেখক সংঘ এবং গোপন সংগঠন বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের প্রধান নেতাদের মধ্যে ৮ জন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়। বেঁচে থাকে মাত্র তিনজন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ

যুদ্ধাহত ছিলেন। সদস্যদের বাকিরা যুদ্ধ শেষে বিভিন্ন পার্টি বা সংগঠনে যোগ দেয়। বাকিরা প্রত্যক্ষ রাজনীতি চালিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় আর ছিলেন না।]

আমি একা হয়ে গিয়েছিলাম। করণীয় নির্ধারণের জায়গায় আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই চিন্তা করলাম আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা শেষ করি। ভর্তি হতে গিয়ে খোঁজ করলাম যে, কোন বিষয়টিতে কম সময় দিয়ে পড়াশোনা করা যায়। এজন্য যারা আমাদের আগের রাজনৈতিক দল বা এসব বিষয়ে করত, তাদের কাছে গিয়েছিলাম পরামর্শ করার জন্য। আমাকে তাদের একজন পরামর্শ দিল, 'একটা সাবজেক্ট আছে ল [আইন]। এটাতে রেগুলার ক্লাস না করলেও পড়াশোনা চালিয়ে নিতে পারবেন। আপনি তো রাজনীতি করবেন, আপনি হয়তো ক্লাশে এতো বেশি সময় দিতে পারবেন না। তাই এই সাবজেক্টে পড়েন।' তখন সাবজেক্ট ছিল জুরিসপ্রুডেন্স। এলএলবি ল ছিল না। হয়ত নাইটকোর্সে অমন ডিগ্রি ছিল। বিএ পাশ করার পর হয়ত এল এলবি করা যেত। সে জন্য বিএ পাশ করতে হত। আমি তো ইন্টারমিডিয়েট পাশ। তাই ১৯৭৩ সালে তিন বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) কোর্সে ভর্তি হলাম। বিষয় জুরিসপ্রুডেন্স। ভর্তি হওয়ার সময় তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। সহজেই ভর্তি হতে পেরেছিলাম। তবে ক্লাস শুরু করেছিলাম দেরিতে। প্রথম বর্ষের ক্লাশ শুরু হওয়ার বেশ কিছু দিন পর আমি ক্লাশে গেলাম। আমাকে দেখে, আমার ড্রেস দেখে ক্লাশের ছাত্ররা হাসাহাসি শুরু করে দিয়েছিল। কারণ আমি গ্রামের ছেলে। আমি গ্রাম থেকে উঠে এসেছিলাম, পরে আবার গ্রামেই ফিরে গিয়েছিলাম। আর আমার বেশভূশাও মোটামুটি গ্রাম্য ধরনের ছিল। আমি যে স্যান্ডেল বা চটি পড়তাম তা মোটরসাইকেলের টায়ারের রাবার দিয়ে বানানো। তখন এটাকে বলা হতো হো চি মিন চপ্পল। ভিয়েতনামের হোচিমিন এমন চপ্পল পড়তেন বলে শুনেছি।

প্রশ্ন: সেটা কি তখনকার স্টাইল ছিল নাকি এমনিই পড়তেন?
আবদুস সালাম: এটা ঠিক যুগের স্টাইল ছিল না। তবে বামপন্থীরা এটা পড়ত কারণ তারা দেখানোর চেষ্টা করত যে তারা একটা সিম্পল (সাদাসিধা) জীবনযাপন করছে। আমার ছাত্রজীবনের শুরুটা এমনইভাবে শুরু হয়েছিল।

১৯৭২ সালে সিরাজ শিকদারের সাথে কাজ শুরু করার পর আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করতে না গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে ছাত্রদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করলাম। জাতীয় ছাত্রদল গঠন প্রক্রিয়া থেকে যখন দাওয়াত আসলো তখন আমি যুক্ত হলাম।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত আগেও কিছুটা ছিল। আগেও রাকসুতে ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব ছিল। ইউনিভার্সিটি জুড়ে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের একটা প্রাধান্য ছিল। আর ১৯৭২ সালের পর তো ছাত্রলীগ ছাড়া তেমন করে আর কোনো সংগঠনই ছিল না। পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন তখন ছিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অনুবর্তী, অধীনস্ত। ফলে ছাত্র ইউনিয়নের কোনো ইনডিপেনডেন্ট রোল ছিল না। ফলে আমাদেরকে ইনডিপেনডেন্টলি জাতীয় ছাত্রদল সংগঠিত করতে হয়েছিল।

এই সংগঠনে থেকেই আমি দীর্ঘদিন ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি। এক সময় জাতীয় ছাত্রদল, জাতীয় ছাত্র আন্দোলন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নকে নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠন করেছিলাম। এ সমন্বয় পরিষদ বামপন্থী সংগঠন হিসেবেই পরিচিত ছিল। এ সংগঠনগুলো নানা পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিশেষ করে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি বা পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) এর সঙ্গে। জাতীয় ছাত্রদল ছিল সাম্যবাদী দলের আর বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ছিল ইউনাইটেড পিপলস পার্টির (ইউপিপি) ছাত্র সংগঠন। জাতীয় ছাত্রদলে অন্যান্য পার্টির ছাত্ররা থাকলেও মূলত এটা ভাসানী ন্যাপের ছাত্র সংগঠন হিসেবে পরিচিত ছিল। দীর্ঘমেয়াদী ছাত্র আন্দোলনের পরিকল্পনা নিয়ে তখন আমরা জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করেছি।

প্রশ্ন: তখন কি আপনি শ্রমিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন?

আবদুস সালাম: না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতে আমি আন্ডারগ্রাউন্ড সর্বহারা পার্টির সাথে যুক্ত হই। তখন সর্বহারা পার্টির যে লাইন ছিল, মানে শ্রেণিশত্রু খতম করার যে লাইন, এটার সঙ্গে আমার দ্বিমত ছিল। গণসংগঠন, গণসংগ্রাম এবং গণঅভ্যুত্থানের কথা চিন্তা করতাম। এ কথাগুলো আমি

সংগঠনে বলেছিলাম আর আমার এই চিন্তার কারণেই সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর পর ১৯৭৬ সালে সর্বহারা পার্টির সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রশ্ন: রাজনীতি করছেন দীর্ঘ সময়। রাজনীতির বাইরেও বহু মানুষের সাথে আপনার যোগাযোগ। সেসব মানুষদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল বা এখন কেমন?

আবদুস সালাম: আমার তো অনেক লোকের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল, যারা পার্টি করত না। সাধারণ মানুষ, একা কাজ করেন এমনকি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সাথেও খুব ভালো সম্পর্ক হয়েছিল। যেমন: ছাত্রলীগের নেতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মাসুদুর রহমান ছানা আমার ক্লাশমেট, তার সাথে আমার ফ্রেন্ডশীপ ছিল। অন্যান্য ছাত্র সংগঠন তো বটেই, এমনকি ইসলামী ছাত্র সংঘের এক নেতা, যে আমার হলে থাকত, তার সঙ্গেও আমার মোটামুটি একটা ভালো সম্পর্ক ছিল। এখন যেমন এক ছাত্র সংগঠনের সাথে আরেক সংগঠনের নেতাদের মুখদেখাদেখি বন্ধের ব্যাপার আছে, আমাদের সময় তেমনটা ছিল না। ছাত্র নেতাদের পরস্পরের মধ্যে ভালো একটা সম্পর্ক ছিল। আমরা একসাথে বসতাম। কথা বলতাম। তবে তাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতিক অবস্থান বিষয়ে কথা হতো না, তর্ক-বিতর্কও নয়। আমি কেবল তাদের সাথে ক্লাশ, পড়াশোনা এসব নিয়েই কথা বলতাম। নিজেরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী নিজেরা কাজ করতাম। সে সময় ছাত্র নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ খুব কম হতো। এখন যেসব হরদম হয়, বা হচ্ছে, তা আমাদের সময় ছিল না। মোটামুটি একটা সুসম্পর্ক ছিল, অন্তত তখনকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমনও হয়েছে যে, আমরা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেছি। যেটা বামপন্থী নেতারা অনুমোদন করেননি। পরে নেতারা আমাদেরকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন এমনটা করতে গেলাম। কিন্তু আমরা রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণেই অমন ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছি। যেমন : একটা ইস্যু ছিল। ড. মোহম্মদ আবদুল বারীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন পাকিস্তান-পক্ষের লোক। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৭২ সালে তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি ভাইস চ্যান্সেলর হন (১৯৭৭ সালে)। তখন আমরা বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো

একজন রাজাকারকে ভিসি নিয়োগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি। আমাদের দাবি ছিল ড. বারির অপসারণ। সে আন্দোলনে আমাদের ছাত্র সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির পাশাপাশি ছাত্রলীগও আন্দোলন করেছে।

আরেকটি ঘটনা হয়েছিল সে সময়। আমাদের সঙ্গে বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস)-এর একটা সংঘর্ষ হয়েছিল। বিডিআর সদস্যরা আমাদের ওখানে ওয়াটার পোলো খেলত। এজন্য তারা আমাদের সুইমিং পুল ব্যবহার করত। ফলে ছাত্রদের সাথে বেয়াদবিমূলক ঘটনা ঘটার ফলে বিডিআর সদস্যদের সঙ্গে ছাত্রদের একটা মারপিট হয়। বিডিআর সদস্যরা শিক্ষক আর ছাত্রদের সুইমিং পুলে জিম্মি করে ফেলে। তখন ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়লে, বিশাল একটা অভ্যুত্থানের মতো হয়েছিল। ছাত্ররা সুইমিং পুল ঘিরে ফেলেছিল। এ নিয়ে সারারাত বড় ধরনের আন্দোলন হয়েছিল। পরে বিডিআর-এর ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তারা আমাদের শিক্ষক আর ছাত্রনেতাদের সাথে আলাপ করে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ একটা সমাধান হয়ে ছিল যে, বিডিআর সদস্যরা আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং পুল ব্যবহার করা করবেন না।

সে সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট (গুরুত্বপূর্ণ) আন্দোলন হয়েছিল। ইউনিভার্সিটির ভেতরে পুলিশের একটা ক্যাম্প ছিল। ছাত্ররা এটাকে নিজেদের জন্য একটা অমর্যাদাকর ব্যাপার মনে করেছিল। তাদের মত ছিল, ইউনিভার্সিটিতে কোনো পুলিশ ক্যাম্প থাকবে না। কারণ তারা মনে করত ইউনিভার্সিটির নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রক্টোরিয়াল বডি, ইউনিভার্সিটি গার্ড, নাইট গার্ড এসব থাকাই যথেষ্ট। প্রয়োজনে ক্যাম্পাস পুলিশ ফোর্স তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু বাইরের পুলিশ ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থান করবে, এটা হতে পারে না। অর্থাৎ পুলিশ হটাও। তাছাড়া পুলিশ সদস্যরাও ছাত্রদের নানাভাবে হয়রানি করত। ক্যাম্পাসের ছোটখাট দোকানদারদের কাছ থেকে তারা পয়সা-টয়সা নিত। ফলে পুলিশের ভূমিকা ছিল বেশ আপত্তিজনক। আমরা ছাত্ররা দীর্ঘদিন আন্দোলন-প্রতিবাদ করে পুলিশ ফাঁড়ি প্রত্যাহার করতে প্রশাসনকে বাধ্য করেছিলাম।

এখন কিন্তু উল্টোটা হচ্ছে। ছাত্ররা নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ফাঁড়ির দাবিতে আন্দোলন করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে পুলিশ ক্যাম্প রাখা হয়েছে। একটা সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে, যেখানে ছাত্ররা লেখাপড়া করে,

সেখানে তো চোর ডাকাত ক্রিমিনালদের তো কোনো অস্তিত্ব নেই। তাহলে সেখানে পুলিশ ক্যাম্প কেন হবে? এটা ছাত্রদের মর্যাদার জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসনের জন্য, সেটির ইমেজের (ভাবমূর্তির) জন্য ক্ষতিকর। তারপরও তথাকথিত নিরাপত্তার কথা বলে পুলিশ রাখা হয়েছে। এক সময় ছাত্ররা সম্মান বা আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য পুলিশ ফাঁড়ির বিপক্ষে কথা বলেছে, এখন আবার ছাত্ররা পুলিশ ফাঁড়ি চায়। এই বিপরীত ঘটনা কেন হয়েছে? প্রশাসনের যে অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিল, যে ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার দরকার ছিল সেগুলো না হওয়ার কারণেই এগুলো ঘটছে।

তো এভাবে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা আন্দোলনে যুক্ত হই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা পাঁচ দফা ভিত্তিক আন্দোলন করেছি। ছাত্র সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি থেকে আমরা অনশন করেছিলাম। আমিও অনশনে অংশ নিই। পাঁচ দফার অন্যতম দফা ছিল ভিসি ড. এমএ বারীর অপসারণ। ঐ সময় (১৯৭৭ সালে) জিয়াউর রহমান ছিলেন রাষ্ট্রক্ষমতায়। ওই সরকারের মন্ত্রী এটি বারী এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আবদুল বাতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন আন্দোলনরত ছাত্রদের সাথে কথা বলার জন্য। তাঁরা ছাত্রদের আহ্বান জানান যেন তারা অনশন প্রত্যাহার করে নেয়। প্রাথমিক আলোচনায় মন্ত্রী ড. বারীকে অপসারণের ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে ব্যর্থ হন। তাই ছাত্রনেতারা প্রথমদিকে মন্ত্রীর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়।

তারপর ওখানকার লোকাল প্রশাসনের যে কমিশনার ছিলেন সফিউল আজম, যিনি আবার ছিলেন মোনায়েম খানের ভাগিনা এবং একজন ঘৃণিত ব্যক্তি তাঁর মধ্যস্থতায় আলোচনার প্রস্তাব দেয়। অমন এক ব্যক্তির মধ্যস্থতায় আলোচনায় বসতে রাজি হয়নি ছাত্ররা।

পরে (অচলবস্থা কাটাতে) আমরাই উদ্যোগী হলাম। জানালাম যে, একদল ছাত্র প্রতিনিধি প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সাথে রাজশাহী সার্কিট হাউজে আলোচনায় বসবে। প্রতিনিধিরা গেল, আলোচনাও শুরু হলো। ওদিকে ছাত্র প্রতিনিধিরা যখন আলোচনারত, তখন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ছাত্রনেতাদের না জানিয়ে গোপনে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন অনশনকারী ছাত্রদের সাথে কথা বলতে।

ওখানে তাঁরা যাওয়ার পর ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। এক পর্যায়ে ছাত্ররা তাদের ঘেরাও করে ফেলল। এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যে ছাত্রদের আর নিয়ন্ত্রণের আর কোনো পথ রইলো না। সেই মুহূর্তে মন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য আমরা তাদেরকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের এর একটি রুমে নিয়ে গিয়ে বসানোর ব্যবস্থা করলাম।

এটি বারী অসুস্থ ছিলেন। তাঁর হার্টের অসুখ ছিল। তাই তাঁর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের একজন ডাক্তারকে আনালাম। চিকিৎসার পর তাঁর রেস্ট নেওয়ার জন্য আমরা বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করলাম। তারপর তাকে বললাম, " আপনি আমাদেরকে না জানিয়ে, না বলে, কেন ছাত্রদের মাঝে গেলেন?" ইত্যাদি। এদিকে বাইরে পুলিশ ভীষণ উদ্বিগ্ন। এমন কথা প্রচার হয়েছে যে, মন্ত্রীকে আটক করা হয়েছে, জিম্মি করা হয়েছে।

এ জিম্মি নাটক শুরু হয়েছিল রাত ৮:০০টায় আর চললো সারারাত ধরে। সকালে যখন মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের সমঝোতা হলো, ঠিক হলো যে, আমাদের চারটি দাবি তাঁরা মেনে নেবেন, কিন্তু এমএ বারীকে অপসারণের ব্যাপারে আমাদেরকে পরে জানানো হবে। ভোর ৫টা-সাড়ে ৫টার দিকে আমরা ছাত্রদের সামনে সমঝোতার ঘোষণা দিলাম। বললাম যে, বেশিরভাগ দাবিই মেনে নেওয়া হয়েছে, তাই এখন মন্ত্রীরা ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যাবেন। তাঁরা গেলেনও। কিন্তু সে সময়ই আমরা লক্ষ্য করলাম যে সারা উত্তরবঙ্গের রায়টপুলিশ এনে ক্যাম্পাসে জড়ো করা হয়েছে। তারা চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে। মন্ত্রীরা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের ওপরে ব্যাপক লাঠি চার্জ ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ শুরু হলো।

ফলে ঘটনা আর ছাত্রনেতাদের কন্ট্রোলে থাকল না। পুলিশের সাথে ছাত্রদের ব্যাপক মারামারি লেগে গেল। এটা চললো প্রায় দুই-তিন ঘণ্টা ধরে। এক পর্যায়ে ছাত্ররা পুলিশকে মেরে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিলো। স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের প্রায় তিন-সাড়ে তিন শ ছাত্র হকিস্টিক নিয়ে এসে পুলিশদের পিটিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বিতারিত করে দিলো।

ছাত্রদের এ রেজিস্টেন্সের কারণে পুলিশও পাল্টা ফায়ারিং শুরু করলো। ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে আরো লাঠিচার্জ করলো। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ

অনেককে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের প্রায় ৩০ জনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল।

ঘটনার দিন আমি গ্রেফতার হইনি। হয়েছিলাম পরে। ঘটনার পর ইউনিভার্সিটি বন্ধ ঘোষণা করার পরও আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কেন আন্দোলন করছি তা সবাইকে জানাতে আমরা ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করলাম। ঢাকায় তৎকালীন মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজের মধ্যস্থতায় আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেক্রেটারিয়েটে আলোচনায় বসলাম। সরকারের ডাকে ছাত্রপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা হল। আমাদের শর্ত ছিল, ওই বৈঠকে আমাদের গ্রেপ্তার করা যাবে না। তো সেখানে আলোচনা হলো যে আমরা ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাবো, শান্তির বারতা তৈরি হবে আর ক্লাশ খোলার পরে ডঃ বারীকে অপসারণ করা হবে। তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। তিনিও সব মানলেন।

ঐদিন একটা ঘটনা ঘটলো। আমরা যখন প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে গেলাম, দেখলাম সেখানে ড. বারী উপস্থিত। আমরা বললাম, যে ড. বারীর উপস্থিতিতে আমরা কোনো আলোচনা করব না। কারণ উনি আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছেন এবং উনি যেহেতু প্রতিপক্ষ, তাই তিনি আলোচনায় থাকলে আমরা অংশগ্রহণ করবো না। তখন তাঁকে ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো।

এ পুরো আলোচনাটা যে একটা চক্রান্ত ছিল, এটা বুঝেছিলাম পরে। পরদিন যখন আমি রাজশাহীতে ফিরছি, পথে নাটোরে পুলিশ আমাকে বাস থেকে নামিয়ে গ্রেফতার করল। ঘটনাগুলো ঠিক কবে বা কোন তারিখে ঘটেছিল তা মনে নেই। তবে এ ঘটনা ঘটেছিল ক্যাম্পাসে ছাত্রদের ওপরে পুলিশের লাটিচার্জ হওয়ার প্রায় ২ মাস পর। আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম জুলাই মাসের দিকে এবং পরে আরো অনেক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

যেখানে ছাত্রদের সাথে সরকারের আলোচনা হলো যে, গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রদের ছেড়ে দেওয়া হবে, সেখানে তাদের না ছেড়ে নতুন করে বহু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হলো। এ কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের শান্তিপূর্ণ অবস্থা আর ফিরলো না। ছাত্ররা আন্দোলন করতেই থাকল। পরে রাজশাহী জেলের

ভেতরেও আমাদের একটা বড় আন্দোলন করতে হয়েছিল। সেটা ১৯৮০ সালের ঘটনা। তা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলাপ করা যাবে।